আজকাল

শোভা সেন
সুধীর চক্রবর্তী
একরাম আলি
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

রমানাথ রায়
বাণী বসু
শীর্ষ

এক ঝাঁক বাঙালি।

কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়।

সময় বের করে গানবাজনা।

আচমকা তুষারপাত। পিটসবার্গের রাস্তায় কার্নেগি মেলনের বাঙালি গবেষকরা।

বাঙালি বহুমুখী। যেখানেই থাকুক, আড্ডা, গান, কবিতা, নাটক, উৎসব— সবই তার চাই। এম আই টি, স্ট্যানফোর্ড বা ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলি যেমন, তেমনই কম্পিউটার বিজ্ঞানে বিশ্বসেরা পিটসবার্গের কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের একঝাঁক বাঙালি গবেষকের বহুমুখী দিনযাপন। লিখছেন **আষিক**

কম্পিউটার বিজ্ঞানের এভারেস্টে বঙ্গবাসর

তারিখটা ছিল ১৪ আগস্ট ২০১১, পিটসবার্গ বিমানবন্দরে ড. রাজেশ ভট্টাচার্যের জন্য অপেক্ষা করে আছি। না, আমার কোনও পরিচিত বন্ধু নন তিনি, সামান্য আলাপ একটি ফেসবুক কমিউনিটিতে। কিন্তু তাতেই আন্তরিকভাবে বলেছিলেন, পিটসবার্গ কবে আসছ জানিও, সম্ভব হলে তোমাকে আনতে যাব। উত্তর আমেরিকায় এ আমার প্রথম প্রবাস নয়। এর আগে স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন ভ্যাঙ্কুভারে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়, মাইক্রোসফ্‌ট হেড কোয়ার্টার রেডমন্ডেও কিছুকাল চাকরির অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে যে অভিজ্ঞতা একেবারে প্রথম— তা হল বিশ্বের এক নম্বর কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে গবেষণার। আয়তনে ছোট এবং বে এরিয়ার শিল্পরাজ্যের প্রভূত আর্থিক অনুদানে সমৃদ্ধ না হলেও, আর তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: স্ট্যানফোর্ড, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এম আই টি) এবং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলির সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেয় কার্নেগি মেলনের এই কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ। প্রায় প্রতিটি সমীক্ষাতেই কম্পিউটার সায়েন্স পঠন-পাঠন ও গবেষণার গুণগত মানের নিরিখে যৌথভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তর আমেরিকার এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। কম্পিউটার সায়েন্স ছাড়াও কার্নেগি মেলনের কারিগরি বিভাগ, টেপার বিজনেস স্কুল ও স্কুল অফ ড্রামা বিশ্বমানের।

তা বিশ্বের এক নম্বর কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, কী রকম ছাত্রছাত্রী আসে এখানে গবেষণা করতে? তালিকায় একবার চোখ বোলালে দেখা যাবে, একাধিক রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত আইআইটিয়ান, এ সি এম প্রোগ্রামিং বিশ্বকাপের স্বর্ণপদক বিজয়ী; এম আই টি, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলি, হার্ভার্ড, প্রিন্সটন, ক্যালটেক, সিংহুয়া, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ— প্রায় প্রতিটি প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাধিক ছাত্রছাত্রী পাড়ি জমিয়েছে পিটসবার্গের এই কার্নেগি মেলন ক্যাম্পাসে। কেবল পড়াশোনাতেই তুখোড় নয়, আই আই টি বম্বের আদিত্য রামদাস আক্ষরিক অর্থেই অলরাউন্ডার। ওমানের হয়ে অনূর্ধ্ব ষোলর ক্রিকেট বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। এখন মেশিন-লার্নিং নিয়ে গবেষণা করছেন। রয়েছেন ডেনমার্কের অন্ডার্স ওল্যান্ড। জীবনের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন রকস্টার। ডেনমার্কের সর্বোচ্চ সঙ্গীত খেতাব গ্র্যামি জয়ের পর এন্ডার্স এসেছেন কার্নেগি মেলনে গবেষণা করতে। বিষয়: কম্পিউটার মিউজিক। কাল্পনিক চরিত্রদের মধ্যে সবাইকে ছাপিয়ে যাবেন ডা. বশীকরণের ভূমিকায় সুপারস্টার রজনীকান্ত, রোবট সিনেমায় যিনি সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন কার্নেগি মেলনে তাঁর পি এইচ ডি-র কথা! ছাত্রছাত্রীরাই যদি এ রকম ঝলমলে, উজ্জ্বলতায় অধ্যাপকরা যে তাদের টেক্কা দেবেন, এ আর আশ্চর্য কী! কম্পিউটার সায়েন্সের জনক অ্যালান টিউরিংয়ের নামাঙ্কিত টিউরিং খেতাবই এই বিজ্ঞান শাখার সর্বোচ্চ সম্মান। বর্তমানে আমাদের বিভাগে রয়েছেন তিনজন টিউরিং বিজয়ী। প্রাক্তন অধ্যাপকদের মধ্যে প্রয়াত হার্বার্ট সাইমনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নোবেল এবং টিউরিং, এই যুগ্ম সম্মানের বিরল অধিকারী তিনি। সম্প্রতি ম্যানুয়েল ব্লাম, এই তিন টিউরিং বিজয়ী অদ্যাপকের একজন, তাঁর একটি ক্লাস করার সুযোগ ঘটেছিল আমার। সেই ক্লাসে ছিলেন এন্ডার্সও। পায়চারি করতে করতে সঙ্গীতে জাতীয় সম্মানের অধিকারীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন কম্পিউটার সায়েন্সের সর্বোচ্চ খেতাব বিজয়ী ৭৫ বছরের এক চিরতরুণ বিজ্ঞানী। ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে। মনে হচ্ছিল, সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের এক উৎকর্ষের সাক্ষী হচ্ছি আমি।

ছাত্রদের মতোই অধ্যাপকদের অনেকেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সর্বোচ্চ মানের গবেষণার পাশাপাশিই বিবিধ বিষয়ে আগ্রহ রাখেন তাঁরা। ২০০৭ সালে আমেরিকার কলেজ টেনিসে বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন সোমদেব দেববর্মন। ঠিক ৭ বছর আগে সেই একই সম্মান অর্জন করেছিলেন কেভন ফাতাহালিয়ান, এখন কার্নেগি মেলনে কম্পিউটার গ্র্যাফিক্সের অধ্যাপক। আমার রিসার্চ অ্যাডভাইসর মেশিন ট্র্যানস্লেশনের অন্যতম দিকপাল বিজ্ঞানী হাইমে কার্বোনেল। দাবা নিয়ে একদিন আলোচনা হচ্ছিল। কথাচ্ছলে উনি জানালেন একজন গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারানোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। এর আগে জানতামও না উনি দাবা খেলেন। অথবা নাম্বার-থিয়োরির উল্লেখযোগ্য নাম নুঁথ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী গ্যারি মিলার— তাঁর ছাত্র আমেয়াকে একদিন চমকে দিয়েছিলেন ওঁর প্লেন চালানোর গল্প বলে। এই রকম ছোটখাটো চমক আমাদের অনেকেরই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে গেছে।

কার্নেগি মেলনের গবেষণার প্রভাব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে। হাল আমলের যে কোনও ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলবার আগে ফ্রেমে উপস্থিত মানুষের মুখের চারিদিকে যে চৌকো বাক্স এঁকে ক্যামেরা বুঝিয়ে দেয় কতগুলি মানুষের মুখ সে ফ্রেমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে, সেই 'ফেস রিকগনিশন টেকনোলজি'র সর্বপ্রথম পদ্ধতিগুলির একটি রোবোটিক্স-এর আবিষ্কারের পেছনে অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক তাকিও কানাদে-র অবদান রয়েছে। অনলাইন দুনিয়ায় অনেকেই হয়ত খেয়াল করেছেন, পাসওয়ার্ড ভুল টাইপ করলে স্ক্রিনে উপস্থিত হয় প্রায় পড়া যাচ্ছে না এমন শব্দযুগল। এদের মধ্যে একটি তবু বা যা পড়া যায়, দ্বিতীয়টি উদ্ধার করা আরও শক্ত। অনেক ওয়েবসাইটে ঢুকবার জন্যও এই শব্দযুগল ঠিকভাবে টাইপ করতে হয়। কম্পিউটার সিকিউরিটির একটি খুবই সহজ কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর এই প্রযুক্তির নাম রি-ক্যাপচা, ম্যানুয়েল ব্লামের ছাত্র লুই ভন আনের (কার্নেগি মেলনের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান অধ্যাপক) আবিষ্কার। তবে দুটি শব্দ ব্যবহার করার কারণটি বেশ চমকপ্রদ। প্রথম শব্দটি ব্যবহার করা হয় মানুষ ও মেশিনকে আলাদা করে শনাক্ত করার জন্য। দ্বিতীয় শব্দটি আসলে কোনও একটি বই থেকে নেওয়া, যার যান্ত্রিক পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। এইভাবেই হাজার হাজার মানুষের ছোট্ট ছোট্ট অবদানে এগিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ তৈরির কাজ।

ডিপার্টমেন্টের ভিতর মাঝেমধ্যেই হেঁটেচলে বেড়াতে দেখা যায় 'কোবট'-কে। কার্নেগি মেলনের এই রোবটের অনেক প্রতিভার মধ্যে বিশেষ একটি হচ্ছে টেলিপ্রেজেন্স। অনেক অধ্যাপকই ক্যাম্পাসে এই মুহূর্তে উপস্থিত নেই, কিন্তু একটি জরুরি মিটিংয়ে থাকতে পারলে ভাল হত— এই রকম পরিস্থিতিতে সাহায্য নেন কোবটবাবুর। কোবটের 'চোখ ও কান' দিয়ে পেতে থাকেন পুরো মিটিংয়ের আঁখো-দেখি হাল হকিকত।

গোটা ডিপার্টমেন্টের আনাচে-কানাচে ভেসে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক কৌতূহলী মনের অসংখ্য প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তর। সেই প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা, একদল বাঙালি ছাত্রছাত্রী। সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিবেশে অসংখ্য ভাষাভাষী বন্ধুদের মধ্যেও গড়ে উঠেছে আমাদের আলাপ, বন্ধুতা। দিল্লির প্রবাসী বাঙালি সায়ক সেন, মুম্বইয়ের প্রবাসী বাঙালি জয়দীপ বিশ্বাস, উত্তর কলকাতার অভিনব দুবে, চট্টগ্রামের সেলিম আখতার চৌধুরি, আর কল্যাণীর আমি। সঙ্গে রয়েছে হাওড়া নিবাসী টেপার বিজনেস স্কুলের রাজেশ ভট্টাচার্য, দুর্গাপুরের বাসিন্দা মেকানিক্যালের সৌরভ চ্যাটার্জি, উত্তর কলকাতার শুভাদিত্য মজুমদার, ইলেকট্রিক্যালের ছাত্র রায়গঞ্জের অনিরুদ্ধ বসাক। চট্টগ্রাম থেকে রায়গঞ্জ টু কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই— বাংলাকেও আমরা কম আন্তর্জাতিক করে তুলিনি।

এবারে ফিরে আসি সেই প্রথম দিনের ফ্ল্যাশব্যাকে, যেখানে আমাকে গাড়িতে লিফট দিয়েছিলেন স্বল্পপরিচিত রাজেশ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় দিন, তখনও আমার নিজের ফোন হয়নি, রাস্তাঘাট চিনি না তেমন, দুটো বাস বদল করে আমার বাড়িতে চলে এল সেলিম। রমজান চলছে, উপবাসের মাস, তার মধ্যেও সেলিম নিয়ে এসেছে আমার জন্য ডিমের খিচুড়ি। ভাবির রান্নার তারিফ করতে করতে, ওর কাছ থেকে জেনেছি কোন কোর্স কতটা কঠিন। সেদিন বুঝতে পারিনি রাজেশদার সঙ্গে এরপর কত কত শনি-রবিবার গান, গল্প, আড্ডা, সিনেমা ফোটোগ্রাফি, লংড্রাইভে কেটে যাবে। এ-ও বুঝিনি, সেলিমের সঙ্গে এরপর যখনই দেখা হবে, আমরা মেশিন-লার্নিং নিয়ে কোনও আলোচনাতেই যাব না, কারণ দেখা হবে টেবিল টেনিস বোর্ডে, আর খেলাও হবে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মানসিকতা নিয়ে।

এই প্রতিযোগিতা কার্নেগি মেলনের সর্বত্র সম্পূর্ণ সুস্থতা নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। একে অপরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানোয় কারও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, মালিন্য নেই বন্ধুদের সাফল্যের আনন্দে ভাগীদার হওয়াতে। কিন্তু আরও ভাল কাজ করতে হবে, নিজেকে এবং সবাইকে ছাপিয়ে যেতে হবে— এই মানসিকতা সমস্ত ছাত্রকেই দিয়েছে এক তীব্র প্রতিযোগী মন। পরীক্ষা খারাপ হলে আমার আগের ইউনিভার্সিটি ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অন্তত চার-পাঁচজন ছাত্রছাত্রী পেয়ে যেতাম দলভারি করার জন্য। কার্নেগি মেলনে বোধহয় কারোরই পরীক্ষা খারাপ হয় না, তাই পরীক্ষা ভাল না হলে মোটামুটি নির্বান্ধব হয়ে যেতে হয়— দলে আর কাউকেই পাওয়া-টাওয়া যায় না। অনেকের কাছেই তাই প্রথম দিকের সেমেস্টারগুলি এই কঠোরতম প্রতিযোগিতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সময়। খাপ খাইয়ে নিতে হয় আবহাওয়ার সঙ্গেও। উইস্লাওয়া স্জিম্বরস্কা তাঁর কবিতায় বলেছিলেন, মেঘ সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে খুব তৎপর হতে হয়, কারণ মেঘটি বড় দ্রুত পাল্টে যায়। পিটসবার্গের আবহাওয়া সম্পর্কে লিখতে গেলেও খুব কম তৎপর হলে চলবে না। হঠাৎ ঠান্ডা, হঠাৎ গরমে গত বছর মে মাসে একদিন তাপমান শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছিল। পরের দিন আবার উনিশ ডিগ্রি। গ্রীষ্মকালে ভালই গরম পড়ে, মুষলধারে বৃষ্টিও হয় মাঝেসাঝেই। এই খামখেয়ালি আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোন দিন সোয়েটার লাগবে আর কোন দিন রেনকোট— বোঝা দুষ্কর। নভেম্বর থেকে মার্চ অবধি দীর্ঘ সময় বরফে ঢেকে থাকে শহর। ব্যক্তিগতভাবে শীত আমাকে বেশি বিব্রত করে না, এর আগে কমবেশি শীত ভ্যাঙ্কুভার বা সিয়াটলেও পেয়েছি। তবে আগস্ট মাসেও সায়ককে জ্যাকেট গায়ে অল্পবিস্তর কাঁপতে দেখি। মানিয়ে নিতে হয় এক ভিন্নতর জীবনযাত্রার সঙ্গেও। হোমওয়ার্ক, ক্লাস, পরীক্ষা, গবেষণা— হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও খেয়াল রাখতে হয় বাড়িতে চাল ফুরিয়ে গেছে কি না, ইলেকট্রিক বিল সময়মতো দেওয়া হল কি না, পর্যাপ্ত পরিমাণে কাচা জামাকাপড় আছে কি না— এই সব টুকিটাকি। পি এইচ ডি ছাত্রদের মধ্যে গান ও রান্না জানা ছেলের সংখ্যা অসম্ভব বেশি (গানটা অপশনাল হলেও রান্নাটা কম্পালসরি)। ব্যক্তিগতভাবে রান্নাবান্নার ব্যাপারে আমি সামান্য উদাসীন। আমার সীমিত সিলেবাসে মাংসের দুটি পদ আর একটি সবজির খিচুড়ি পড়লেও অনেক বন্ধুবান্ধবই রীতিমতো চমৎকার রান্নাবান্না করে। চিংড়ি-ইলিশ, লুচি-আলুরদম থেকে শুরু করে চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল— রান্নার জগতে তাদের অবাধ বিচরণ।

কার্নেগি মেলনে পড়ার সুবাদে অনেক রকমের সুযোগ ঘটে। সম্প্রতি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল অঙ্ক অলিম্পিয়াডের অনুশীলন ক্যাম্প আইডিয়াম্যাথ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সময় ক্লাসে ঢুকবার আগের মুহূর্তে যে উত্তেজনা অনুভব করতাম, সারা বিশ্বের খুদে অঙ্কবিদদের পড়ানোর সময়ও প্রায় একই অনুভূতি হয়েছিল। ক্যাম্পাসে আই আই টি-র ছাত্রের তুলনায় যাদবপুরের ছাত্রসংখ্যা সামান্য কম, অথচ পড়ানোর সময় ছাত্রদের মেধা নিয়ে আমার খুব উঁচু ধারণাই হয়েছিল। যাদবপুরের ছাত্রছাত্রী কীভাবে আরও বেশি সংখ্যায় কার্নেগি মেলন বা এম আই টি, স্ট্যানফোর্ডে আসতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে যাদবপুরেরই প্রাক্তন ছাত্র অনিরুদ্ধ জানাল— 'কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেকট্রিক্যাল, এই দুই নবীন বিজ্ঞান শাখা খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে, সেই পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে আরও বেশি তাল মিলিয়ে সিলেবাস পরিবর্তন করলে যাদবপুর থেকে আরও অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখানে সুযোগ পাবে।'

'গভীরে যাও, আরও গভীরে যাও, এই বুঝি তল পেলে, ফের হারালে, প্রয়োজনে ডুবে যাও'— বাইশে শ্রাবণের সিরিয়াল কিলার প্রবীর রায়চৌধুরির জন্য অনুপমের এই গান যেমন প্রযোজ্য, একজন পি এইচ ডি স্কলারের জীবনেও এই গান কিছু কম লাগসই নয়। দিনের পর দিন একটি পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকবার মতো মনে হতে পারে। কারও হয়ত একটুর জন্য উপপাদ্যের প্রমাণ মিলছে না, কেউ হয়ত দুই শতাংশের ব্যবধানে সেরা পদ্ধতিটিকে অতিক্রম করতে পারছে না। কারও আবার পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেছে অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল প্রায় একই রকম কাজ করে টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়ায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি বিশাল অংশ ঘিরে রয়েছে আমাদের গবেষণা— তার দিনগত ব্যর্থতা ও প্রাত্যহিক উদযাপন।

বিষয়টি ইন্টারেস্টিং লাগলে 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমার র‍্যাঞ্চো যে কোনও ক্লাসরুমে বসে পড়ত। ভিরু সহস্রযুদ্ধের মতো কোনও অধ্যাপক না থাকলেও র‍্যাঞ্চোর মতো আমরা অনেকেই বসে পড়েছি কম্পিউটার সায়েন্সের আওতার বাইরের অনেক ক্লাসে— পাবলিক পলিসি থেকে শুরু করে আমেরিকান পোয়েট্রি— অভিনয় থেকে শুরু করে রেকর্ডিং— যার যাতে আগ্রহ। গত সেমেস্টারে আমেরিকান পোয়েট্রির ক্লাসটিতে পুশকার্ট পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি জেরার্ড কোস্টানজোর সান্নিধ্যে আলাপ হয়ে গিয়েছিল রবার্ট ব্লাই, টেড কুজার, মারভিন বেল প্রমুখ আমেরিকান কবিদের লেখার সঙ্গে। কেবলমাত্র শখের জন্যই নয়, গবেষণার কাজে লাগলে যে কোনও বিভাগের ছাত্র নাম লেখাতে পারে যে কোনও কোর্সে। অনিরুদ্ধর মতে, যাদবপুরেও কোর্স নির্বাচনে এই অবাধ স্বাধীনতা চালু করা উচিত।

জনশ্রুতি বলে, সময় বাঁচাতে এক ভারতীয় ছাত্র নাকি অ্যামাজনে কার্টন-কার্টন ম্যাগির হোম ডেলিভারি নিত। সে রকম চরম পদক্ষেপ না নিলেও বন্ধুরা সকলেই বুঝেশুনে সময় খরচ করে। সারাক্ষণ মাথা গুঁজে কেবল কাজ না করে, প্রায় প্রত্যেকেই কাজ, বিনোদন, শখ, আহ্লাদ— সমস্ত কিছুর একটি সুস্থ ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা করে। ইয়ান্নির কনসার্ট শোনা থেকে শুরু করে পেইন্টবল খেলা— সবই হয়। কিন্তু হিসেব করে, যাতে কাজের জন্য কখনও সময় কম না পড়ে। তাই ল্যান্ডস্কেপ ম্যাগাজিনের বিশ্বব্যাপী ম্যানফোটো প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রাজেশদা ব্যস্ততার মধ্য থেকে বের করে নিতে পারে ফোটোগ্রাফির মতো সময়সাপেক্ষ শখের জন্য পর্যাপ্ত অবসর, পিটসবার্গ ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করার জন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকেই আদিত্য নিয়ে ফেলে কয়েক মাসের ঢালাও প্রস্তুতি। কাজে কোনও রকম ফাঁকি না দিয়েও নিজের প্যাশনের জায়গাগুলিকে ধরে রাখবার প্রেরণা বন্ধুদের থেকেই পাই। উচ্ছল, প্রাণবন্ত, মিতভাষী, লাজুক, যেমনই হোক না কেন, সমস্ত বন্ধুর মধ্যেই এক তীব্র জেদ দেখতে পাই। আদিত্যর আয়রনম্যানের সাফল্যে (সাইকেলে ১১২ মাইল, ২৪ মাইল সাঁতার ও একটি ম্যারাথনের ট্রায়াথলন প্রতিযোগিতা), শুভাদিত্যর গিটারে একটি জটিল একক বাজনা তুলে ফেলবার মধ্যে, অনিরুদ্ধর দাবায় গ্রুনফিল্ড ডিফেন্স আয়ত্তে আনার চেষ্টায়, সায়কের লুদোভিকো ইনওদির পিয়ানো কম্পোজিশন বাজানোয়, সেলিমের টেবিল টেনিসের টপস্পিন— সব ক্ষেত্রেই দেখতে পাই নিজেকে আরও পরিশীলিত করার, সেই অতিরিক্ত এক মাইল হাঁটার দুর্বার প্রত্যয়। এই নিষ্ঠা আমাকেও স্পর্শ করে। তাই গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে কবিতা লেখা, নিউ ইয়র্কের 'অফ-ব্রডওয়ে' নাটক 'হাফ-হার্টেড'-এ সুর সংযোজনা। কার্নেগি মেলনের বন্ধুদের সংস্পর্শে না এলে এত ব্যস্ততার মধ্যেও এত কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হত কিনা জানি না।

বাঙালি বোধহয় শেষ পর্যন্ত চেনা যায় আড্ডায়। আমাদের ব্যস্তসমস্ত দিনের মধ্যেও চার-পাঁচজন বন্ধু মিলে প্রতি মাসে অন্তত দু'দিন নৈশভোজ ও আড্ডার বন্দোবস্ত হয়। এই আড্ডার ভাল নাম 'সোসিও-পলিটিকো-কালচারাল' আড্ডা। আড্ডায় চলে আসে হরেক প্রসঙ্গ। বেলা টারের টুরিন হর্স থেকে শুরু করে অনীক দত্তর 'ভূতের ভবিষ্যৎ', 'জাতিস্মর' বা 'দেড় ইশকিয়া' এখনও না দেখতে পারার ছটফটানি। ফেডেরার-এডবার্গের নতুন জুটি থেকে আনন্দ-কার্লসেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, উৎপলকুমার বসুর 'বেলা এগারোটার রোদ' থেকে ওক্তাভিও পাজের 'ইস্ট স্লোপ', ফার্মার শেষ উপপাদ্য থেকে এ বি সি কনজেকচার-এর সম্ভাব্য প্রমাণ, উডি অ্যালেনকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক থেকে কামদুনি, মধ্যমগ্রাম— আড্ডা দৌড়তে থাকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। বাঙালি যেমন আড্ডায় চেনা যায়, তেমনই চেনা যায় উৎসবে। সেলিমের বাড়িতে ইদের দাওয়াত বা পিটসবার্গ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে বন্ধুবান্দবদের জমায়েত দেখে বুঝি, প্রবাসেও বাঙালিদের উৎসবমুখরতা ম্লান হয়ে যায়নি।

বাঙালি চেনা যায় সংস্কৃতিতেও। তাই সৌরভের সঙ্গে চলতে থাকে কবিতা আলোচনা, আদানপ্রদান ঘটতে থাকে ক্যাম্পাস আর ক্যাম্পাসের বাইরের কবিতাপাঠের আসরের সুলুকসন্ধানের। তবে বিচ্ছিন্ন ব-দ্বীপ নয়, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান যেন মোহনায় এসে মিশে গেছে। তাই ইন্ডিয়ান গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েসনের কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করি দোল ও দীপাবলির অনুষ্ঠানে। বন্ধুরা মিলেমিশে সারারাত রাত জেগে আমার সুর করা গানে ছটি ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কথা লিখে ফেলে। সুরের সীমানা ছাড়িয়ে যায় দেশ-মহাদেশের বিভাজনরেখা, দীপাবলির জন্য আমার নতুন গানে মিশে যায় ইস্তানবুলের নুর, আমেরিকার ক্যারল আর তাইওয়ানের জেসিকার তারবাদ্য।

জয়দীপ জানাল, কার্নেগি মেলনে মাস্টার্স শেষ হওয়ার পরে কেরিয়ারের পরবর্তী লক্ষ্যনির্ধারণই ছিল তার পিটসবার্গ জীবনের সবথেকে বড়ো ক্রাইসিস। সুযোগের প্রতুলতাও একধরণের সমস্যা। গুগল, ফেসবুক, পিক্সার, ডিজনি, মাইক্রোসফ্‌টের মতো হেভিওয়েট কোম্পানিতে মোটা মাইনের চাকরির হাতছানি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার সুযোগ, অথবা নিজস্ব স্টার্ট-আপ খুলবার স্বপ্ন— সমস্ত রকমের সম্ভাবনা পিএইচডি-পরবর্তী জীবনের সিদ্ধান্তকে জটিল করে তোলে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও হাজার রকমের প্রশ্ন— আমেরিকায় হলে ওয়েস্ট কোস্ট না ইস্ট কোস্ট? নাকি ইউরোপ? নাকি ঘরের ছেলে একদম ঘরেই ফিরে যাবে? দেশে ফিরবার প্রশ্নে জয়দীপ জানাল, সে রোবট নিয়ে বিশ্বমানের কাজ করতে চায়, সেই কাজ ভারতেই হোক বা অন্য কোথাও। মূলত সুরক্ষাক্ষেত্র ও মহাকাশবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই ভারতের বর্তমান রোবট গবেষণা। জয়দীপের ইচ্ছে পার্সোনাল রোবট নিয়ে কাজ করবার, যে রোবট হয়তো ভবিষ্যতে কোনও বিকলাঙ্গ বা বৃদ্ধ মানুষকে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করবে। প্রায় একই সমস্যা শুভাদিত্যর। তার গবেষণার বিষয় 'ন্যানোস্কেল হিট ট্রান্সফার'। শুভাদিত্যর ধারণা, আগামী ১০ বছরেও ভারতে কোনও কোম্পানিতে এই নিয়ে কাজ শুরু হবে না। তাই ভারতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও মনের মতো কাজ

এরপর ২ পাতায়

CyanMagentaYellowBlack